মাতৃপ্রসঙ্গ

শ্রীমা সারদা দেবী : এক মৌলিক ব্যক্তিত্ব

স্বামী ঋতানন্দ

ঈশ্বরাবতার ও তাঁর লীলাসঙ্গিনীর আবির্ভাব ঘটেছে যুগে যুগে—যেমন রামচন্দ্র-সীতা, শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর হ্লাদিনী শক্তি রাধা, বুদ্ধ-গোপা, শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়া আর এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবী।

বর্তমান যুগসমস্যা ব্যাপক ও গভীর। এই যুগসমস্যা সমাধানের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিকাশ ঘটাতে হয়েছে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে। এযুগের বিশেষত্ব এই যে, এবারে ধর্মস্থাপনার কাজে সক্রিয়ভাবে ব্রতী হয়েছেন তাঁর লীলাসঙ্গিনী বা 'সহধর্মিণী' সারদা দেবী। সেইসঙ্গে ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ গৃহী ভক্তদের জীবনাচরণের প্রভাব যুগধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। এযুগের ধর্মসংস্থাপনে তাই 'সঙ্ঘবদ্ধ' ভূমিকার প্রাধান্য লক্ষণীয়। সেটি এই যুগের যুগধর্মও বটে। বর্তমান অবতারলীলার এটি এক অভিনব বৈশিষ্ট্য।

অবতার ও তাঁর লীলাসঙ্গিনী—অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির মতো অচ্ছেদ্য। পূর্বের অবতারদের ব্যক্তিত্বের অন্তরালে তাঁদের লীলাসঙ্গিনীরা যেন প্রায় আবৃত, তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা এবং সক্রিয়তা সেভাবে প্রকাশিত বা প্রকটিত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর জীবন এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী। তাঁরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে অথচ প্রয়োজনে স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা বজায় রেখে যৌথভাবে যুগপ্রয়োজন ও যুগদাবি সিদ্ধ করেছেন। পূর্বের অবতার ও তাঁদের লীলাসঙ্গিনীদের পরস্পরের অভিন্নতা অনেকটাই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর অভিন্নতার প্রকাশ স্বাভাবিক ও সর্বজনবোধ্য। যুগাবতারের জগৎ-কল্যাণের দায়ভার প্রকৃত সহধর্মিণীর মতোই 'শ্রীমা' বাস্তবে গ্রহণ করেছেন এবং তা সুচারু ও পরিশীলিতরূপে সম্পন্ন করেছেন।

কাশীপুর পর্ব। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা কাল। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ধীরে ধীরে ছাঁচ পাচ্ছে অন্তরঙ্গ-সান্নিধ্যে। সেই পর্বে একদিন খাওয়ার সময় ঠাকুর আনমনা। শ্রীমা সারদাকে জগৎকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আকুল আহ্বান, যদিও সামান্য খেদোক্তিতে—''হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজেকে দেখিয়ে) এ-ই সব করবে?'' অন্য সব মায়েদের অসহায়ত্ব নিজের উপর আরোপ করে শ্রীমা বললেন, ''আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?'' এ যেন ছেলেভুলানো মুখের কথা। ঠাকুর উত্তর দিলেন, ''না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো!'' মা আবার অনুযোগের স্বরে বললেন, ''আমি মেয়েমানুষ! তা কি করে হবে?'' অনুযোগ যেন চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে। পুরুষতন্ত্র একাই যেন এতদিন জগৎকল্যাণের কাজটি করার

জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মেয়েদের সে-কাজে সমর্থ মনে করার স্বীকৃতি তো ছিল না। ঠাকুর তখন নিজেকে দেখিয়ে বললেন, ''এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।'' একথার মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যতে শ্রীমায়ের শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ কাজের পূর্ণাবয়ব দান করার শক্তি সম্পর্কে ঠাকুরের নিশ্চিত অনুধাবন ক্ষমতা। শ্রীমা কথা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলে ফেললেন, ''সে যখন হবে, তখন হবে।'' কথাটি এড়ালেন কিন্তু দায়টি নিলেন। দায়টি এড়াতে পারেননি। সেটিই শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে তাঁর শক্তিরূপিণী শ্রীমায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রথম অঙ্গীকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যলীলার অবসানের পর তাঁর পরিবর্তিত ব্যক্তিত্বরূপে শ্রীমায়ের আত্মপ্রকাশ ও জগৎকল্যাণ সাধন এক অপার বিস্ময়। সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও ভাবাদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও বিশ্লেষক। তাঁর বহু বিশ্লেষণ ও তত্ত্বোদ্ঘাটন রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে কিংবদন্তি হয়ে থাকবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার বালক, তাঁর হাতের যন্ত্র—এই বালকভাব অথবা যন্ত্ররূপের প্রাধান্যই প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত। শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভাবকে স্বীকৃতি দিয়েও এক অভিনব অনন্য বিশ্লেষণ দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করে বললেন, ''বাবা, জান তো ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'' কথাটি যত সহজভাবে শ্রীমা বললেন, তত সহজভাবে জানা ছিল না। এটি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এক নতুন আবিষ্কার। শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার সন্তান এটিই সর্বজনবিদিত। তিনি জগতের সকলের মাতৃস্বরূপ এবং জগতের মানুষ তাঁর সন্তানস্বরূপ—এটি মায়ের এক মৌলিক আবিষ্কার।

জগৎকল্যাণে শ্রীমাকে যে নিযুক্ত হতে হবে, সেটি তিনি নিজেও অনুভব করেছেন : ''যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল, আমিও যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না তুমি থাক; অনেক কাজ বাকি আছে।' শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকি আছে।''

সর্বধর্মসমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জনপ্রিয় অবদান বলেই স্বীকৃত। সেটিকে স্বীকার করেও ঠাকুরের জীবনবিশ্লেষক শ্রীমা নতুন শব্দের প্রয়োগে জানালেন ঠাকুরের জীবনের বিশেষত্ব 'ত্যাগ'—'স্বাভাবিক ত্যাগ।' মায়ের ভাষায় : ''এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ওরকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনও কেউ দেখেছে? সর্বসমন্বয়-ভাবটি... ওটিও ঠিক। অন্যান্য বারে একটা ভাবকেই বড় করায় অন্য সব ভাব চাপা পড়েছিল।''

একজনের ত্যাগ অন্যের কষ্টের কারণ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাভাবিক ত্যাগ কারও কষ্টের কারণ হয়নি। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে বনবাস, সীতাহরণ, লঙ্কাকাণ্ড, অগ্নিপরীক্ষা, সীতাবিসর্জন—একের পর এক দুঃখময় ঘটনার সমাবেশ। শ্রীকৃষ্ণজীবন যুদ্ধবিগ্রহ ও আত্মীয়-পরিজনের অবিরাম ধ্বংস ও নাশে পূর্ণ। সিদ্ধার্থের বুদ্ধ ও নিমাইয়ের মহাপ্রভু চৈতন্য হয়ে ওঠার পিছনে রাজ্যত্যাগ, মাতা-পিতা-স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ চিরদিন মানুষকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে। কিন্তু লোকালয়ে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের অবিরাম তপস্যা ও সাধন, স্ত্রীগ্রহণ, মায়ের মনে কষ্ট হবে বলে সন্ন্যাসী হয়েও গেরুয়াবস্ত্র পরিধান না করা—অথচ সর্বসাধনে অচিরে সিদ্ধ হওয়ার পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ প্রতিনিয়তই কাজ করেছে। তবে সে-ত্যাগ কঠোর-কঠিন, নির্মম-নিষ্ঠুর না হয়ে 'স্বাভাবিক' রূপে ঘটেছে। এত সূক্ষ্ম বিষয়টি শ্রীমার দৃষ্টি এড়ায়নি। এটিই তিনি উন্মোচন করেছেন 'স্বাভাবিক ত্যাগ'—এই অনবদ্য শব্দচয়নে।

প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে আসছেন মা। পথে খুব জ্বর। রাতে একটি কালো কুচকুচে মেয়ে তাঁর গায়ে

মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে গায়ের জ্বালা তখনই জুড়িয়ে গেল। মেয়েটি শ্রীমাকে জানালেন, ''তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।'' অন্যান্য অবতারদের সঙ্গিনীদের মতো শ্রীমা এবারে আগে লোকান্তরিত হবেন না এবং তিনি ঠাকুরের কাজের অংশীদার হবেন, একে অপরকে সাহায্য করবেন—এ-ভাবনার বীজ একথার মধ্যে রয়েছে।

তাপিত জগতকে মাতৃভাবরসে স্নিগ্ধ করার জন্যই ঠাকুর মাকে রেখে গেছেন। যে-উদ্দেশ্য সাধনে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন, মাকে অবলম্বন করে সেই মাতৃভাবের পরিপুষ্টি ও বিকাশ সাধন দক্ষিণেশ্বরেই সূচিত হয়েছিল। অষ্টাদশী পত্নীকে ষোড়শীপূজাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে আবাহন করে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন : ''হে বালে, ইঁহার শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া, ইঁহার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।'' অর্থাৎ, জগন্মাতাই সারদারূপে জগৎকল্যাণে ব্যাপৃত ছিলেন।

একদিন শ্রীমা ঠাকুরকে খাবার দিতে যাচ্ছেন। মন্দস্বভাব একটি মেয়ে খাবারের থালা চেয়ে নিল 'মা' বলে। ঠাকুর খেতে পারলেন না। মায়ের কাছ থেকে ঠাকুর কথা আদায় করে নিতে চাইলেন—''বল আর কখনো কাউকে দিয়ে পাঠাবে না, তুমি নিজে নিয়ে আসবে।'' মা তাঁর স্বাধীন সত্তাকে রক্ষা করলেন। সত্যবদ্ধ হলেন না, বরং নির্ভয়ে দিলেন চিরন্তন এক দৈবী প্রতিশ্রুতি : ''মা বলে কেউ যদি চায়, না বলতে পারব না।'' তারপর আত্মপ্রকাশের যে-কারণ, তা বিস্মৃতপ্রায় অবতারপুরুষকে স্মরণ করিয়ে দিলেন অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক একটি কথায় : ''তুমি তো শুধু আমার নও, তুমি জগতের সকলের।''

বালকভক্ত বেশি খেয়ে ফেললে রাত জেগে জপধ্যানের সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারে—ঠাকুরের এই আশঙ্কায় মায়ের প্রতিবাদী মনোভাব : ''ও দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন?'' মাতৃত্বের লক্ষ্মণরেখার ভিতর স্বকীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত মা স্বয়ং ঠাকুরকেও প্রবেশের অধিকার দিচ্ছেন না। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঠাকুর আশঙ্কা প্রকাশ করলে শ্রীমা ভবিষ্যতের দায় গ্রহণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছেন, ''তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব।'' ঠাকুরের কাজে মায়ের শরিক হওয়ার কথা এভাবে মা প্রকাশ্যে জানালেন।

ঠাকুরের কাছে সামান্য ভর্ৎসিত হলে মধুর ভাবের সাধিকা এক পাগলিনীকে আগলাতে চাইছেন শ্রীমা, বলছেন, ''আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়!'' কী মৌলিকতাপূর্ণ ভাব! দায় নেওয়ার কী আকুল আগ্রহ! আধুনিক মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ স্মিতহাস্যে মায়ের এই স্বাধীন মনোভাবকে মান্যতা দিচ্ছেন।

দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে কালীপদ ঘোষের স্ত্রীকে মায়ের কাছে পাঠানো, ত্যাগী সন্তানদের অনেকের কাছে মায়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, সমাধি ভাঙানোর জন্য কী কী মন্ত্র জপ করণীয় ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে রয়েছে ঠাকুরের মাকে দায়গ্রহণের উপযুক্ত করে তোলার আভাস। তাছাড়া যোগীন ও সারদাপ্রসন্নকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য ঠাকুর মাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শ্রীমা যেন স্বাভাবিকভাবে ঠাকুরের কাছ থেকে পরবর্তী জীবনের করণীয় দায়িত্বগুলি গ্রহণ করেছিলেন।

একটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভাবান্দোলনকে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হতে গেলে তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন :

ক) আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ অনুভূতি বা দর্শন।

খ) ভাবাদর্শগুলির দার্শনিক তত্ত্বে উন্নীত হওয়ার ক্ষমতা।

গ) বিশাল জনমানসে প্রভাববিস্তারের ক্ষমতা অর্থাৎ বহুসংখ্যক মানুষের ভাবাদর্শটির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

শ্রীমায়ের জীবন আধ্যাত্মিক দিব্যদর্শনে ভরপুর। সে-দর্শনগুলি কেবলমাত্র তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর বা পর্বের পরিমাপক ছিল না। সেগুলির মধ্যে প্রতীক হিসাবে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের ভবিষ্যতের আভাস ও ইঙ্গিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে সেগুলিকে শ্রীমা সর্বোচ্চ প্রমাণ (authority) বলে গ্রহণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সর্বোচ্চ আশ্রয় ছিল জগদম্বা। শ্রীমাও সেই ভূমিকাটি পালন করেছেন—একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির থেকে মাতালের মতো টলতে টলতে এসে শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?'' মা উত্তর দিলেন, ''না, না, তুমি মদ কেন খাবে? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।'' ঠাকুর আশ্বস্ত হয়ে বললেন, ''ঠিক বলেছ।'' বলে আনন্দ করতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা—তৎকালেই একে অপরের কাছে এবং অন্যদের কাছে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

রাধুর আগমন ও উপস্থিতি শ্রীমা সারদার জীবনকে পরবর্তী কালে জগৎকল্যাণে আবর্তিত করেছে। ঠাকুরের অদর্শনের পর মায়ের মনে উঠেছিল, ''আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে?'' হঠাৎ দেখলেন, লাল কাপড় পরা দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর আবির্ভূত হয়ে তাকে দেখিয়ে মাকে বললেন, ''একে আশ্রয় করে থাক। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।'' এ-ঘটনার অনেক পরে শ্রীমা একদিন জয়রামবাটীতে মামাদের বাড়ির বারান্দায় বসে রয়েছেন। রাধুর মা সুরবালা তখন বদ্ধ পাগল—কতকগুলি কাঁথা বগলে নিয়ে চলেছে। রাধু হামা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার পিছু ধরেছে। মায়ের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল—ভাবলেন, ''তাইতো, একে আমি না দেখলে আর কে দেখবে?'' ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলেন, ঠাকুর দর্শন দিয়ে বললেন, ''এই সেই মেয়েটি, একে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।'' রাধুর কান্না অর্থাৎ অসহায়ত্ব দেখে মায়ের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল অর্থাৎ জগৎকল্যাণে প্রবৃত্ত হওয়ার এক বিশাল ঝড় অনুভব করলেন। ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলেন। জগতের সকল সন্তানকে একদিন তুলে নেবেন, ঘটনাটির মধ্যে যেন রয়েছে তারই ইঙ্গিত। ''একে আশ্রয় করে থাক''—এ যেন শ্রীমায়ের জীবনে ভাবমুখে থাকার আদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণকে জগন্মাতা তিনবার ভাবমুখে থাকার আদেশ দিয়েছিলেন। শ্রীমাকে জনকল্যাণে নিয়োগ করতে তাঁর জীবনলীলায় রাধু মায়ের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যোগমায়া।

স্বামী সারদেশানন্দজী উল্লেখ করেছেন : ''রাধুর মা পাগলী মামী বলেছেন, 'রাধি রাধি করে মা ব্যস্ত ও ব্যাকুল হওয়ার আগে মাকে দেখে সাক্ষাৎ এক দেবী মূর্তি মনে হত, কাছে ঘেঁষতে সাহস হত না। ভয় করতো'।'' তিনি শুনেছেন রাধুর আসার আগের কথা—ধ্যানস্থ তাঁর জড়বৎ মূর্তিকে গোলাপ-মা, যোগীন-মা চিত্রপুত্তলিকার মতো তুলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বসাতেন; দেহের হুঁশ নেই।... রাধু এল, মন নিচে নামল, সংসার বাড়ল, সংসারী সাজলেন, সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুললেন, সংসারের দুঃখকষ্ট, শোকতাপ অন্তরে অনুভব করলেন। জীবের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হল, তাদের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিলেন—আর্ত, ভীত কলির জীব মাকে পেয়ে মায়ের স্নেহসুধা পান করে নবজীবন, নবীন বল লাভ করল।

শ্রীমায়ের জীবনে রাধু যে বাহ্য অবলম্বন হবে তা শুধু উপরিউক্ত দুটি দর্শনেই পরিসমাপ্ত হয়নি। পরবর্তী সময়েও দেখা যায়, যখনই শ্রীমায়ের জীবন থেকে রাধুর উপস্থিতির অভাব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেছে, তখনই মা অনুরূপ দর্শন পেয়েছেন। একবার শ্রীমাকে কলকাতায় রেখে সুরবালার সঙ্গে

রাধুকে জয়রামবাটী পাঠানোর বন্দোবস্ত হচ্ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় মা জপ করতে বসে দর্শন করলেন, জয়রামবাটীতে রাধু উন্মাদিনী সুরবালার যথেচ্ছ ব্যবহারে কষ্ট পাচ্ছে; এমনকী যে-কোনও সময়ে তার প্রাণহানির সম্ভাবনা। দেখেই মা বিচলিত হয়ে তখনই আসন ত্যাগ করে যোগীন-মাকে সমস্ত খুলে বললেন যে, রাধুকে ফেলে তাঁর কলকাতায় থাকা চলবে না। রাধুর কল্যাণার্থে তাঁকে জয়রামবাটী যেতেই হবে। এরপর শ্রীমা রাধু ও তার মাকে নিয়ে দেশে চলে গেলেন।

শ্রীমায়ের জীবনটি অনুধ্যান করলে মনে হয় বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগেও 'মাতৃহারা' মানুষকে সেবাযত্ন দিয়ে আশ্বস্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে দরদি কোমল সত্তা সুপ্ত রয়েছে, সেই সংবেদনশীল স্বরূপকে সচেতন করে বিকশিত করতে সাহায্য করাই রামকৃষ্ণ-ভাবধারার লক্ষ্য। হিংসা-দ্বেষ-স্বার্থে জর্জরিত আধুনিক সমাজে এই মাতৃভাবের উন্মেষ করাই ছিল যেন শ্রীমায়ের জীবনের সমস্ত প্রয়াসের গূঢ়তম অভীপ্সা।

এই অভীপ্সার পিছনে ছিল শ্রীমায়ের একটি দিব্যদর্শন। নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি। জ্যোৎস্না-আলোকিত রাত। যেন আলোর প্লাবন। হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনজনিত দুঃসহ বিরহবেদনা। সম্মুখে রজতশুভ্র গঙ্গার তরঙ্গরাশি। চকিতে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যতনুর উদয় এবং মুহূর্তে পুণ্যসলিলা গঙ্গায় বিলয়। অতর্কিতে নরেন্দ্রের আবির্ভাব। এ যেন সেই 'আমি যাচ্ছি তুমিও এসো' অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ-অঙ্কিত চিত্র—সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ, পশ্চাতে ময়ূররূপী নরেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-তনুবাহিত পুণ্যতোয়া গঙ্গার পবিত্রবারি নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত অগণন জনসমষ্টির উপর ছড়িয়ে দিতে লাগলেন আর তার স্পর্শে সকলে মুহূর্তে হল মুক্ত। এ-দর্শন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের এক চিরন্তন প্রতীক।

এতদ্‌সত্ত্বেও শ্রীমা মনে করতেন—শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ কাজের সামান্যই সুসম্পন্ন হয়েছে, বাকি রয়েছে অনেক কিছুই। সেবাকাজের প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলেছিলেন, ''ঠাকুর এসেছেন, এরকম কত কি হবে, কত নতুন কাণ্ড ঘটবে। তাঁর সেবার কাজ ফেলে ছুটে যাও কেন? বাজিকর বাজি করে, দেখে অপরে মুগ্ধ ও অবাক হয়ে যায়, কিন্তু তার বাড়ির মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে কাঁথা সেলাই করে, তারা আপনার কাজ নিয়ে থাকে, মুগ্ধ হয় না।"

শ্রীমা সারদাই যথার্থ বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের নিগূঢ় তাৎপর্য—''ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। আর এই সংসার তাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা।" আশ্চর্য, এই ছোট অথচ অব্যর্থ প্রার্থনাটির মধ্যেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ (motto)—আত্মমুক্তি ও জগদ্ধিত—দুই-ই স্পষ্টত বিধৃত। মায়ের এই প্রার্থনাটি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের। এর অনেক পরে স্বামীজী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শটি নির্দিষ্ট করেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।'

জগতের সকলে পূর্ণতার লক্ষ্যেই চলেছে। ধর্মবিমুখ নাস্তিক পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজজীবনের উৎকর্ষ চায়। এইসব ধর্মনিরপেক্ষ অথচ যুক্তিনির্ভর মানুষের এইধরনের ঐহিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষাতেও শ্রীমায়ের জীবন এক আকর পাথেয়।

প্রথমত, সত্য। জগৎ ও জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যরক্ষিত না হলে জীবনযাপন অসংলগ্ন ও অর্থহীন আদানপ্রদানে পর্যবসিত হয়। আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় শর্ত 'সত্য'। সারদা দেবীর জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে 'সত্য'। তিনি সত্যস্বরূপিণী, সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে রামকৃষ্ণ মিশন

এক গভীর সংকটময় পরিস্থিতির কবলে পড়ে। ব্রিটিশ-অধীন ভারতবর্ষে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে। অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী সেসময় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সন্ন্যাসী হতে এসেছিলেন। তাতে ব্রিটিশ সরকার রামকৃষ্ণ মিশনের উপর ক্ষুব্ধ হয়। অনেকেই সেদিন প্রাক্তন বিপ্লবীদের মঠ থেকে বিতাড়িত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ শ্রীমাকে সব কথা জানান। শ্রীমা সব শুনে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, ''ওমা, এসব কী কথা? ঠাকুর সত্যস্বরূপ, যেসব ছেলে তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের-দশের আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে, তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা?'' অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, সব কথা শুনে মা বলেছিলেন, ''ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ মিশন হয়েছে; রাজরোষে নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে, নয় তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।''

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য শর্ত হল 'নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি'। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিরপেক্ষ ভূমিতে দাঁড়িয়ে মতপ্রকাশ হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। কোনও বিশেষ পক্ষের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট না থাকলে সত্যকে স্বচ্ছাবস্থায় দর্শন করা যায়। পক্ষপাতহীন জাগ্রত বিবেকই সত্যকে দিবালোকের ন্যায় দেখতে পারে। সমগ্র জীবনে শ্রীমা বহুক্ষেত্রে তাঁর নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত জানাতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত বা বিচলিত বোধ করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনের সময় তিনি 'উন্মাদ' হয়ে গেছেন, এরকম সংবাদ জয়রামবাটী গ্রামে সারদা দেবীর কানে পৌঁছলে, শ্রীমা স্বীয় অটল সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন, ''একথা যদি সত্য হয়, তাহলে এসময় তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সেবা করা আমার কর্তব্য।'' শ্রীমা তা-ই করেছিলেন, তিনি এসেছিলেন, এসে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দেখলেন, প্রাণের দেবতাকে যেমন দেখেছিলেন তিনি ঠিক সেইরকমই আছেন। কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজস্বতা প্রকাশ ও তদনুরূপ কাজ করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এটি। এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে ঠাকুর সম্পর্কে সর্বপ্রথম শ্রীমায়ের মনোভাব জানা যায়। অন্য একটি ঘটনা—আগে স্বভাব ভাল ছিল না এরকম এক মহিলা শ্রীমায়ের কাছে আসত। ঠাকুর তার সঙ্গে মিশতে মাকে নিষেধ করলেও সে মায়ের কাছে আসছে দেখে ঠাকুর ক্ষুণ্ণ হলে মা বলেছিলেন, ''ও এখন ভাল কথাই তো কয়...।'' মা বুঝেছিলেন মহিলাটি যখন তাঁর কাছে আসছে, সে ভাল হতেই চায়, আর তাঁর সংস্পর্শে সে ভাল হবেই। নিজের উপর কতটা আস্থা নিয়ে মা একথা বলেছিলেন ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়।

সেকালে থিয়েটারকে ঘৃণ্যস্থান মনে করা হত, থিয়েটারের নামে ভদ্রলোকেরা নাসিকা কুঞ্চন করতেন, থিয়েটারের ঠিকানা শিক্ষিত লোকেরা জানলেও বলতেন না, বলাটা অন্যায় মনে করতেন। সমাজে বিদগ্ধজনের যখন এরকম প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব, তখন ব্রাহ্মণঘরের বিধবা শুদ্ধাচারিণী শ্রীমা তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের নাড়িনক্ষত্র জেনেও একাধিকবার সাগ্রহে গিয়েছেন থিয়েটারে। দেখতে গিয়েছেন বেশ কয়েকটি থিয়েটার—কোনও ঘৃণা নিয়ে নয়, স্নেহ নিয়ে, ভালবাসা নিয়ে। নটীকে দিয়েছেন শিল্পীর সম্মান, দিয়েছেন মানুষের স্বাভাবিক প্রাপ্য মর্যাদা। অতি শুদ্ধাচারের বাতিকে সেসবের নিন্দা করে আত্মশ্লাঘার পরিচয় দেওয়ার দরকার হয়নি তাঁর। তিনি প্রমাণ করেছেন, পবিত্রতায় সকলের অধিকার। নটীদের তাঁর পদস্পর্শ করতে দিয়েছেন, নিজে তাঁদের মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করেছেন।

শ্রীমায়ের কাছে নট-নটীরা আসতেন বলে

বলরামবাবুর স্ত্রী গোলাপ-মার মারফত জানিয়েছিলেন, তাঁরা মায়ের কাছে এলে তিনি আর আসবেন না। গোলাপ-মায়ের মুখে ওই কথা শুনে শ্রীমা জানিয়েছিলেন, একজন এলে আর একজন যদি না আসে তাহলে তিনি কী করতে পারেন? অর্থাৎ, বলরামবাবুর গৃহিণী না এলেও শ্রীমা নট-নটীদের যাতায়াত বন্ধ করবেন না। এইরকম কঠিন নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত শ্রীমায়ের জীবনে প্রচুর আছে। কে বলছেন, তা মায়ের কাছে গুরুত্ব পেত না, কী বলছেন অর্থাৎ বিষয়টিই ছিল তাঁর কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যেমন স্বামীজীর অনেক সিদ্ধান্ত মা অনুমোদন করলেও সব সিদ্ধান্তই তিনি স্বীকার করেননি।

তৃতীয়ত, অপরকে মর্যাদাদান গণতন্ত্রের একটি শিক্ষণীয় বিষয়। দেখা যায়, শ্রীমা বিভিন্ন বিষয়ে যোগীন-মা, গোলাপ-মার সঙ্গে, এমনকী রাধুর শ্বশুরালয়ে তত্ত্ব পাঠানোর সময় নলিনীদিদির সঙ্গে পর্যন্ত পরামর্শ করছেন এবং সেইমতো কাজ করছেন। এককথায় বলা যায়, কারও ভাব নষ্ট না করে, সমাজের বিভিন্ন পর্বের, ধর্মের ও বর্ণের মানুষকে সন্তানজ্ঞানে সমান ভালবাসা প্রদর্শন করে বিশ্বজনীন মাতৃত্বে উত্তরণ শ্রীমা সারদার জীবনে আধুনিকতার এক উচ্চাবস্থার পরিস্ফুরণ।

চতুর্থত, কালের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মনোভাবটি শ্রীমার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ছিল। দুর্গাপুরী ইংরেজি পড়বেন কি না সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ হলে শ্রীমা স্পষ্ট মত দেন, ''আমার মেয়ে দুর্গা ইংরেজি পড়বে।'' সেইরকম, ব্রহ্মচারীদের জ্ঞানার্জনস্পৃহা বাড়ানোর জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সেবায় নিযুক্ত ব্রহ্মচারীদের তিনি একদিন বলেছিলেন, ''ওদেশ থেকে অনেক সাহেব-সুবো ভক্ত আসবে; তোমরা ইংরেজি লেখাপড়া শিখে নাও।'' শ্রীমা একাজে প্রথমে স্বামী ধর্মানন্দ এবং পরে ঢাকার কৃষ্ণভূষণবাবুকে নিযুক্ত করেন।

পঞ্চমত, শ্রীমায়ের ছিল প্রখর বাস্তববোধ। মায়ের একটি যুবক-ভক্ত চিঠিতে লেখে, সে যেখানে চাকরি করে সেখানে একটু-আধটু মিথ্যা বলতে হয় বলে সে চাকরি ছেড়ে দিতে চায় এবং মায়ের মতামত জানতে চায়। মা পত্রলেখককে লিখে দিতে বললেন, সে যেন চাকরি না ছাড়ে। মা বললেন, ''এখন একটু-আধটু মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে বলে চাকরিটি ছেড়ে দিতে চাইছে। চাকরি ছেড়ে অভাবে পড়লে স্ত্রীপুত্র-পরিজনের মুখে দুটো অন্ন জোটাতে পরে চুরি-ডাকাতি পর্যন্ত করতে পিছপা হবে না।'' যে-কোনও শাসন ও আইনব্যবস্থার লক্ষ্য হল, অপরাধের দূরীকরণ অথবা হ্রাসকরণ। শ্রীমার সিদ্ধান্তটি অপরাধ হ্রাসকরণের (minimization of crime) দৃষ্টান্ত।

একবার প্রচুর 'খাঁটি দুধ' নিয়ে গোপেশ মহারাজ জয়রামবাটী চললেন। কিন্তু পথে দেখতে পেলেন তাতে ছোট একটি মাছ রয়েছে। তাঁর মনে হল, ওই দুধ ঠাকুরসেবায় লাগবে না; সুতরাং ফেলে দেওয়াই বিধেয়। ফেলে দেওয়ার কথা শুনে মা বললেন, ''ফেলবে কেন? ঠাকুরের ভোগে না দিলেও বাড়ির ছেলেপুলে আছে, তারা তো খেতে পারবে।''

ষষ্ঠত, আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের (Science of Management) মতে, নেতার মধ্যে অপরকে স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষমতা এবং একইসঙ্গে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি থাকবে। এ-তত্ত্বটিকে 'Get on the balcony' বলা হয়। অর্থাৎ 'কাজকর্মকে উপর থেকে দেখা'—এরকম মনোভাব নিয়ে করতে হবে। শ্রীমা বলছেন, ''কায়দায় ফেলে কাজ আদায় করা—সে কী কথা? কাজ দিয়ে দূর থেকে লক্ষ রাখতে হয়। আলগা দিয়ে সব খেয়াল রাখতে হয়।''

সপ্তমত, সর্বজনীনতা আধুনিকমনস্ক মানুষের অত্যুচ্চ অভিব্যক্তি। শ্রীমা তাঁর জগৎপ্লাবী মাতৃত্বে জগতের সকলকে নিজের সন্তান করে নিয়েছিলেন, তাই তিনি 'সকলের মা'। দেশ-কাল-ব্যক্তিকে

ছাপিয়ে সকলের হওয়ার মধ্যেই সর্বজনীনতার চূড়ান্ত সাফল্য। নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর শ্রীশ্রীমায়ের কোনও বিশেষ অধিকার ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কর্তব্যে তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম সেবিকা, অপরপক্ষে দাবির বিষয়ে বা অধিকারবোধে ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি। নিজেকে পিছনে ফেলে সকলকে অকাতরে এগিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদনে। সকলের জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ছেড়ে রেখেছিলেন। অন্যপ্রসঙ্গে বলেছেন, ''ঠাকুর তুমি তো শুধু আমার নও, তুমি জগতের সকলের।''

অষ্টমত, আধুনিক যুগ জ্ঞান ও কর্মকে একসঙ্গে নিয়ে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে জ্ঞান ও বাইরে ভক্তি প্রকাশিত হত। স্বামীজীর ভিতরে ছিল ভক্তি ও বাইরে জ্ঞান। শ্রীমায়ের ভিতরে অদ্বৈতজ্ঞান আর বাইরে অবিরাম কর্মশীলতা। এটি আধুনিক যুগের মানুষের ভাবানুসারী। আধুনিক যুগ ও ভবিষ্যৎ সমাজ হয়ে উঠছে প্রবল কর্মশীল এবং একইসঙ্গে জ্ঞানসমৃদ্ধ। কট্টর জ্ঞানবাদীদের ধারণায় যেখানে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় অসম্ভব ছিল, সেটিই বর্তমান ও ভবিষ্য-সমাজে আকাঙ্ক্ষিত ও করণীয়। স্বামীজীর প্রায়োগিক বেদান্তের সেটিই মূল সুর। আর ব্যাবহারিক জীবনে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন্ত উদাহরণ শ্রীমা তাঁর সমগ্র জীবনটিকে তারই প্রয়োগের শিক্ষণভূমি করে তুললেন। চূড়ান্ত কর্মে প্রবৃত্ত থেকেও অনাসক্তি ও নৈষ্কর্ম্য অনুভব কীভাবে সম্ভব সেটি গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন (৩।২৫) :

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

—অজ্ঞানিগণ আসক্তিবশত যেরূপ কর্ম করে থাকে, জ্ঞানিগণ অনাসক্তচিত্তে লোকপালনার্থ তেমনি কর্ম করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের ভক্ত পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেনের অভিমান ছিল, শ্রীমা তাঁকে কম ভালবাসেন। সেই মর্মে মায়ের কাছে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। শ্রীমা সেই চিঠির উত্তরে পত্রলেখককে লিখতে বলেছিলেন, ''লিখে দাও, আমার মধ্যে এক বই দুই নাই।'' অর্থাৎ, তিনি সকলকে এক দেখেন। এই এক দেখার নাম অদ্বৈত-জ্ঞান। সচরাচর দৃষ্ট নারীজীবনের ভাব, উচ্ছ্বাস শ্রীমা সজ্ঞানে পরিহার করেছিলেন। আবার একইসঙ্গে হয়ে উঠেছিলেন করুণা-ভালবাসা, স্নেহ-মমতার এক অনন্ত প্রস্রবণ।

শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। এক রাত্রে সেবক লক্ষ করলেন মা বিছানায় নেই। খুঁজতে বেরিয়ে দেখলেন, শ্রীমা বাঁহাতে একটি হ্যারিকেন আর ডানহাতে একটি খুরপি দিয়ে তাঁর ঘরের সামনের এবড়ো-খেবড়ো পথের ইট-কাঠ-পাথর তুলে তুলে জায়গাটা সমান করে দিচ্ছেন, যাতে তাঁর কাছে আসতে কারও কষ্ট না হয়!

ঘটনাটি শ্রীমায়ের সমগ্র জীবনের প্রতীকরূপ নির্যাস। একহাতে হ্যারিকেন মানে জ্ঞানের প্রতীক। আর অন্যহাতে খুরপি, সেটি কর্মের প্রতীক। শ্রীমা অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কর্ম করেছেন অবিরাম—যে-কর্ম জগৎকল্যাণের, লোকসংগ্রহের। তাঁর কাছে পৌঁছনোর পথের কণ্টক তিনি নিজেই জগৎজোড়া সন্তানদের জন্য তুলে সরিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তারা নির্বিবাদে, সহজে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে। একদিকে আদর্শ ও উদ্দেশ্য হিসেবে নিজে সহজ হয়ে রয়েছেন, আবার অন্যদিকে তাঁর কাছে পৌঁছনোর পথটিও সুগম করে দিচ্ছেন! জ্ঞান ও কর্মের এক অনবদ্য মৌলিক সমন্বয়।

নবমত, শ্রীমা বলেছেন, ''ভালবাসাই আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।'' শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম এবারে সারদা-প্রস্রবণের মধ্য দিয়ে জগতকে প্লাবিত করছে। মায়ের সমগ্র জীবনটিই ছিল এক দীর্ঘ নীরব প্রার্থনা। শ্রীমায়ের

জীবনের এই দিকটির মানবীয় ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ উন্মোচন নিঃসন্দেহে ঘটেছে প্রায়শ উদ্ধৃত নিবেদিতার সেই অসামান্য রচনায়। নিবেদিতা-জীবনের মহাকাব্যকার শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে সেই অখণ্ড গীতিকাব্যটি 'মৌনের এক মহাসংগীত'। বহুশ্রুত হলেও এ-সংগীত বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। মায়ের অস্তিত্বের গভীরতম সত্যকে কোমলতম অনুভূতির শব্দরেখায় অনন্য নিবেদিতা মৃদু-মিষ্টি-মধুর ছন্দে শুনিয়েছেন :

''ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই; তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারও। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা।... প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখে পাঠাতে পারতাম! কিন্তু জানি, সেও যেন তোমার তুলনায় শব্দমুখর, কোলাহলময় শোনাবে। সত্যিই তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র,—যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি তাঁর সন্তানদের জন্য রেখে গেছেন—যারা নিঃসঙ্গ, যারা নিঃসহায়।... সত্যই ভগবানের অপূর্ব রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে,—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী—এইসব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।''

দশমত, 'আত্মাবলুপ্তি' ছিল মায়ের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সহজাত। ভক্ত সরযূবালা লিখেছেন : ''মায়ের ঈশ্বরত্ব এখানেই যে, মায়ের ভিতর আদৌ 'অহঙ্কার' নেই। জীবমাত্রই অহং-এ ভরা। এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে 'তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা' বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহঙ্কারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি!'' একদিন নলিনীদিকে শ্রীমা বলেন, ''আমি কি, মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—(হাতজোড় করে মা ঠাকুরকে প্রণাম করলেন) আমার 'আমিত্ব' যেন না আসে।''

স্বামী মাধবানন্দ লিখেছেন, ''শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বিবিধ সাধনার অন্তে নিজ সহধর্মিণীকে দেবীজ্ঞানে যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে জপমালাদি বাহ্য উপকরণসহ ঐ সকল সাধনার ফল এবং নিজেকে সমর্পণ করেন। শ্রীসারদা দেবী স্বামীর নিকট এই দেবদুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও সম্পূর্ণ নিরভিমান ছিলেন, ইহা হইতেই তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির গভীরতা অনুমান করা যায়।''

জনৈক স্ত্রীভক্ত মায়ের শেষ অসুখের সময় একদিন তাঁকে 'তুমি জগদম্বা, তুমিই সব' ইত্যাদি বলে যখন প্রশংসা করছেন, অমনি মা রুক্ষস্বরে বলে উঠলেন, ''যাও, যাও, 'জগদম্বা'! তিনি দয়া করে পায়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে বর্তে গেছি! 'তুমি জগদম্বা! তুমি হেন!' বেরোও এখান থেকে।'' আসলে মা ভক্তের আন্তরিক বিশ্বাসে আঘাত না দিলেও এই প্রকার স্তুতিমূলক প্রশংসাবাক্য সহ্য করতে পারতেন না। করুণারূপিণী মায়ের জীবনে এরকম ঘটনা মাত্র এই একটি, যেখানে তিনি তাঁর কাছ থেকে কাউকে বের হতে বলেছিলেন।

বাহ্যভূমিতে শ্রীমায়ের অস্তিত্বের পূর্ণপ্রকাশ উপরি-উক্ত ঘটনাটি। জগতে যেখানে মানুষ স্তবস্তুতি প্রশংসার কাঙাল, সামান্য শ্লেষ, নিন্দা-সমালোচনা অসহ্য, সেখানে দাঁড়িয়ে শ্রীমা যেন নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে জগতকে জানিয়েছেন, স্বরূপে তিনি সর্বদেবদেবী ভগবতী হলেও যেখানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' উপস্থিত সেখানে তিনি 'তদ্ভাবরঞ্জিতাকারা' এক দীনহীন দাসী মাত্র।